সিনেমা অশ্লীল না হলে হিট হবে না - এমন একটি মিথ্ সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করেছেন কয়েকজন প্রযোজক-পরিচালক। তারাই বাংলা সিনেমায় এসেছে অশ্লীলতার যুগ। ব্যবসাসফল সিনেমার তালিকা তৈরি করলে সুস্থ চলচ্চিত্রের প্রাধান্যই দেখা যাবে। তাহলে কেন এই মিথ্যে মিথ্? কি লাভ এতে প্রযোজকদের? আসমলে পেশিশক্তি নির্ভর মেধাহীন একটি শ্রেণী চলচ্চিত্রকে নিজ নিয়ন্টণে রাখার জন্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের চাপ দেয় অশ্লীল ছবিতে অভিনয় করার জন্য। এবার পপি 'না' করেছেন। জোট বেধেছেন অন্যান্য কলাকুশলীরাও। আপত বিজয় হয়েছে সুস্থতার... লিখেছেন জুটন চৌধুরী

পপির না

ভালগার ছবির বিরুদ্ধে চলচ্চিত্র কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ

হঠাৎ করে নড়ে চড়ে উঠলো চলচ্চিত্র! এমন একটা আলোড়ন অনেক আগেই দরকার ছিলো। প্রয়োজন ছিলো প্রযোজক সমিতির বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন। বিশেষ করে সমিতির নেতা এনায়েত করিম ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলম, স্বপ্ন চৌধুরী, শরীফ উদ্দিন খান দীপুদের বিরুদ্ধে। যারা অশ্লীল ছবি নির্মাণ করেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তৈরি করেন শরীরসর্বস্ব কিম্ভূতকিমাকার শিল্পীদের। তারাই যখন তখন মূলধারার শিল্পী-কলাকুশলীদের হেনস্থা করছেন, অন্যায়ভাবে বহিষ্কার কিংবা নির্যাতন করছেন- নিষিদ্ধ করছেন। এটা পুরোপুরি প্রযোজক সমিতি নয়। কতিপয় প্রযোজক এই মাস্তানির উদ্দেশ্যে, তাদের নির্যাতনের হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গঠন করেছেন 'ইমার্জেন্সি অ্যাকশন কমিটি'। সমিতির স্বার্থ সংরক্ষণের নামে সাব কমিটি। এই কমিটির মাধ্যমে তারা ভালগার ছবি তৈরির পথের বাধাকে তুলে ফেলতে চেয়েছিল।

যখন এই কমিটি পপির মতো তারকা শিল্পীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো, তখনই বিপাকে পড়লো ভালো রকম। অ্যাকশন কমিটির পক্ষে ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলম পপির প্রতি এ নোটিশ জারি করেন। প্রযোজক-পরিবেশক সমিতির এই নেতার স্বার্থের ব্যাঘাত হলেই তারা যে কাউকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন এ অভিযোগ আগে থেকেই ছিল। কিন্তু এবার পপিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে, ক্ষমা চাই বলা হলে পপি সরাসরি 'না' বলে বসেন। এতে পুরো ইন্ডাস্ট্রি ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পপির বিরুদ্ধে এ অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইন্ডাস্ট্রির ১৫ সংগঠন এক হয়ে ফেডারেশন গঠন করে। ডাক দেয় তারা আন্দোলনের : ভালগারিটি, নোংরামির বিরুদ্ধে।

পপি কতিপয় নেতার অশ্লীল ছবিতে অভিনয় করেননি বলেই তাদের রোষানলে পড়েছেন। এর আগেও প্রায় একই কায়দায় পপিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। তখন অন্যান্য সংগঠনগুলো নীরব ছিলো। কিংবা বলা চলে প্রযোজকরা তাদের কনভিন্স করতে পেরেছিলেন। সেসময় পপির পাশাপাশি তারা পূর্ণিমাকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। পূর্ণিমা মাফ চাইতে বাধ্য হন এবং সেবার রেহাই পান। নতুন করে শুটিং ডাবিং করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু বলা হয়েছে পপি জেদি, একরোখা। পপির কথা হলো, প্রযোজক আব্দুর রহমান বরফ শিডিউল নিয়েও কাজ করেননি। সে দোষ কার? একজন শিল্পী নিজের ইচ্ছেয় ছবি না করলে সাইনিং মানি ফেরত দেয়ার রীতি রয়েছে। পপি বলেছেন, যদি আমি কাজ না করতাম তাহলে অবশ্যই টাকা ফেরত দিতাম। এই প্রযোজকের কারণে আমার পুরো একমাসের শিডিউল নষ্ট হয়েছে। তারপরও আমি টাকা ফেরত দিতাম। দিতাম মানবিক কারণে। কিন্তু প্রযোজক সমিতি আমাকে সে সময়টুকুও দেয়নি। তারা তিনদিনের নোটিশে আমাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অন্যায়ভাবে আমার ইমেজ নষ্ট করেছেন।

তাদের এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমি বলেছিলাম, আমি প্রযোজক সমিতির অনেকের কাছে লাখ লাখ টাকা পাই, সেগুলো আদায়ের ব্যাপারে আমাকে হেল্প করুন। কিন্তু তারা তা না করে উল্টো আমাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

পপির এই কথার প্রতিবাদ করে সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি ওস্তাদ জাহাঙ্গীর বললেন, পপি বিভিন্ন সময়ে আমাদের কথা দিয়েছেন টাকা ফেরত দেয়ার। কিন্তু প্রতিবার কথার বরখেলাপ করেছেন। তাই আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পপির বিরুদ্ধে অন্তত বিশটি অভিযোগ জমা পড়েছে সমিতিতে।

ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলমের জারিকৃত সার্কুলারের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন প্রযোজক সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদ পারভেজ অর্থাৎ সোহেল রানা। তিনি বলেছেন, প্রযোজক সমিতির কোনো সাব-কমিটি কোনোভাবেই কোনো সার্কুলার জারি করতে পারে না। এ ধরনের কোনো সার্কুলার ঘোষণা একমাত্র নির্বাহী কমিটিই করতে পারে। অথচ এরা ইমার্জেন্সি অ্যাকশন কমিটি নামে সাব কমিটি দিয়ে পপিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এটা নীতি বিরোধী। এটা সংগঠন বিরোধী।

প্রতিবারই প্রযোজক সমিতি ইন্ডাস্ট্রিকে তাদের হাতের মুঠোয় রাখার জন্য নানাভাবে নিজেদের প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে। তাই তারা বারবার পপির মতো গডফাদারহীন নিরীহ শিল্পীদের টার্গেট করেছেন। এবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন শিল্পী কলাকুশলীরা। ১৫ সংগঠনের সমর্থনে গঠিত ফেডারেশন পপির নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়। ফেডারেশনের নেতা আহমেদ শরীফ বলেন, পপি শিল্পী সমিতির সদস্য। শিল্পী সমিতিকে না জানিয়ে প্রযোজক সমিতি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই ফেডারেশনের পক্ষে চাষী নজরুল ইসলাম, আহমেদ শরীফ, সোহানুর রহমান সোহান ও মনোয়ার হোসেন ডিপজল যৌথভাবে ঘোষণা দেন অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের। তারা প্রযোজক সমিতির কয়েকজন নেতাসহ এফডিসির এমডি ওয়াসিমুল বারী রাজিবের অপসারণ দাবি করেন। পরে এমডি রাজিবের পদত্যাগ বিষয়টি শিথিল করেন।

আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে কয়েকটি মূল ইস্যু নিয়ে সভা শুরু করেন। ঐ দিন তারা (২৩ আগস্ট) দশজন অশ্লীল ছবির নির্মাতা ও তেরো জন অশ্লীল ছবির 'শিল্পী'র তালিকা প্রকাশ করে তাদের বহিষ্কার করেন। আর এ ঘোষণাপত্র পাঠ করেন শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন ডিপজল।

চন্দ্রকথা ছবিতে আসাদুজ্জামান নূর ও শাওন

দশজন নির্মাতা হলেন শরীফ উদ্দিন খান দীপু, ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলম, এমএ রহিম, রাজু চৌধুরী, রমজান আলী খান, একে আজাদ খান, স্বপন চৌধুরী, শাহীন সুমন ও আনোয়ার চৌধুরী জীবন। জ্যোতিষী জীবন চৌধুরী। আর অশ্লীল শিল্পীরা হলেন ময়ূরী, ঝুমকা, পলি, ড্যানিরাজ, মেহেদী, শাপলা, মিজু আহমেদ, ফাইটার সালাম, শানু, সুজানা, বিথি, সোনালী ও চিতা। যদিও এ তালিকা সন্তোষজনক নয় বলে অনেকের অভিমত। তারপরেও পপি ইস্যুকে কেন্দ্র করে এদের নামের তালিকা প্রকাশ ছিলো বড় ধরনের একটি সাকসেস। কারণ এর আগেও নেতারা এদের চলচ্চিত্র থেকে বহিষ্কার দাবি করেছিলেন। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অনেক মিটিংও হয়েছে। ফেডারেশনের কয়েকজন নেতা অনন্যোপায় হয়ে একসময় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের কাছে গিয়েছেন। অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত দশজন পরিচালকের একজন শরীফ উদ্দিন খান দীপু বলেন, ডিপজল নিজেই একজন অশ্লীল শিল্পী। ডিপজল অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন যাতে অশ্লীলতায় ভরা। সে কি করে অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করে, তা আমার মাথায় আসে না। আমি ক্যাসেট সংগ্রহ করে দেখাতে পারি ডিপজল সেসব ছবিতে টু'এক্সের মতো অভিনয় করেছেন। এমন কি অশ্লীল নির্মাতা হিসেবে ডিপজলের সুনাম রয়েছে।

ডিপজলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন, আমি ছবিতে কর্মাশিয়াল শট দিয়েছি। তবে এখন থেকে আর সেসব শট দেবো না। কাউকে দিতেও দেবো না। এখন থেকে সুন্দর ছবি দর্শকদের উপহার দিতে চাই।

ডিপজলের মতো অশ্লীল নির্মাতা, শিল্পী কি করে ফেডারেশনের নেতা হলেন। সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, চাষী নজরুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, ডিপজল আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন যে তিনি অতীতে ভুল করেছেন। অনেকটা বাধ্য হয়ে। স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। তবে তিনি এর পরিবর্তন চান। আর এই আন্দোলনে ডিপজলের মতো শক্তি আমাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে এরকম সুযোগ আমরা সবাইকে দিতে চাই।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাসিস্টেন্ট প্রেস সেক্রেটারি আশিক ইসলামের নেতৃত্বে সেন্সর বোর্ডের ৫জন মেম্বার দুটো অশ্লীল ছবি হাতেনাতে ধরতে পেরেছিলেন। নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরের 'আমন্ত্রণ' সিনেমা হলে আমি গুন্ডা আমি মাস্তান ও জলকুড়ির রাজমহলে 'হিংসা প্রতিহিংসা' ছবি দুটোতে

বলা চলে ষাট দশক ছিলো ঢাকাই বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ। সে সময়ে আব্দুল জব্বার খান থেকে শুরু করে জহির রায়হান, সুভাষ দত্ত, খান আতা, মহিউদ্দিন, নারায়ণ ঘোষ মিতা, এহতেশাম, মুস্তাফিজ, কামাল আহমেদরা অনেক রুচিসম্মত বাণিজ্যিক ছবি উপহার দিয়েছেন

কাটপিস সমৃদ্ধ দৃশ্য তারা দেখতে পান। এমনকি বিরতির সময়ে নীল ছবি প্রদর্শনের বিষয়টি তাদের চোখে পড়ে। এই ছবি দুটোর মালিক প্রযোজক সমিতির বর্তমান নেতা শফিউদ্দিন খান দীপু ও মোতালেব হোসেন।

অশ্লীল ছবি নির্মাণ করতে লাগে বাইশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা। সেখানে ভালো ছবিটি ফ্লপ করলে ত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা লস করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু একটি অশ্লীল ছবিতে লস খেলে বড় জোর দশ লাখ টাকা। তাই অসাধু ব্যবসায়ীরা এখানেই এসে টাকা ইনভেস্ট করছেন

তবে এই ঝটিকা হামলা ধারাবাহিক হলেও অশ্লীল ছবি নির্মাণ সহজ হতো না। কারণ বর্তমান ১৯ সদস্যের সেন্সর বোর্ডের অনেকের ফিল্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। আবার এদের একজন প্রভাবশালী মেম্বার এনায়েত করিম। বিভিন্ন সময়ে তিনি আলোচিত হয়েছেন অশ্লীল ছবির নির্মাতা হিসেবে। যদিও ফেডারেশনের ঘোষিত অশ্লীল নির্মাতাদের তালিকায় এনায়েত করিমের নাম ছিলো না। জানা গেছে, রাতের অন্ধকারে এনায়েত করিম ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের কাছে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন যে আর এ ধরনের ছবি নির্মাণ করবেন না। অর্থাৎ ফেডারেশন এনায়েত করিমের মতো লোকদের ভালো হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়, এনায়েত করিম কি করে সেন্সর বোর্ডের মেম্বার হন। অথচ এই এনায়েত করিমকে বলা হয় অশ্লীল ছবির সফল নির্মাতা। মূলত এনায়েত করিমের পথ ধরেই অনেকে এ ধরনের নির্মাণে উৎসাহ পেয়েছেন।

হঠাৎ করে ব্যাপারটা আকাশ থেকে পড়েনি। হঠাৎ করে এই অশ্লীল ছবির জোয়ার সৃষ্টি হয়নি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এগুলো ডালপালা মেলেছে। প্রথমে তারা একটি গানে বা দৃশ্যে অশ্লীলতা আনতো। আস্তে আস্তে সেটা ভাইরাসের মতো পুরো ছবিতে চলে এসেছে। ছবিতে রগরগে নোংরা আর আপত্তিকর দৃশ্য চিত্রায়ণ করার জন্য তারা নতুনদের বেশি করে কাজে লাগিয়েছে। এসব প্রযোজক পরিচালকদের কর্মকান্ড আইনগতভাবে নারী নির্যাতন আওতায় নেয়া যেতে পারে। মফস্বল থেকে স্বপ্ন নিয়ে আসা ব্যর্থ শিল্পীরা জীবনধারণের জন্য বাধ্য হয়ে এদের মুঠোয় যায়, এদের শিকারে পরিণত হয়। পুরনোদের যারা এসব দৃশ্যে অভিনয় করতে রাজি হতো না কৌশলে তাদের নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে অভিনয় করতে বাধ্য করতো এসব নির্মাতা। জানা গেছে, ময়ূরী স্বাভাবিক আবস্থায় কখনো এসব শটে অংশ নিতেন না। সারাক্ষণ গাঁজায় বুঁদ হয়ে থাকেন। ময়ূরীর মতো শানুও গাঁজা পছন্দ করেন। আর ঝুমকা, পলি, ড্যানিরাজরা প্রচুর মদ খেয়ে এসব নোংরা আপত্তিকর শটে অংশ নিতেন। আর অশ্লীল দৃশ্য যখন চিত্রায়ণ করা হতো তখন ফ্লোরে কিংবা রুমে তালাবদ্ধ করে রাখা হতো। এসব জানতেন এমডি রাজিব। রাত ১১টার পর এফডিসিতে শুটিং করতে হলে পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনেক নির্মাতাই সেটা মানতেন না। না মেনে তারা রাত দেড়টা দুইটা পর্যন্ত গোপন দৃশ্য চিত্রায়ণ করতেন। বিশেষ করে কাটপিস হিসেবে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন সিনেমা হলে বিতরণের জন্য নানা দৃশ্য শুটিং করতেন। এমডি রাজিবের সময়ে অশ্লীল নির্মাতাদের সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠাপোষকতা হয়েছে। তার সময়ে এফডিসি বিভিন্ন প্রযোজকের প্রায় ৮০ লাখ টাকা পাবে।

হাতে গোনা পনেরোজন ব্যক্তি অশ্লীল ছবি নির্মাণের পেছনে যুক্ত। এদের বেশিরভাগ নির্মাতার কাগজ-কলমের শিক্ষা নেই। নেই সরাসরি চিত্র নির্মাণের কোনো শিক্ষা। এইসব স্বল্প বিদ্যার ব্যক্তিরা পরিচালকের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। সে সময়ে পরিচালক সমিতির দুই নেতা আজহারুল ইসলাম খান ও মোহাম্মদ হান্নান এদের মেম্বারশিপ দেয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আর যারা প্রযোজক হিসেবে এসব নির্মাণ করেছেন তারা সহকারী পরিচালকদের পরিচালক হিসেবে সুযোগ করে দিয়েছেন। তবে অশ্লীল ছবি অন্যদের নিয়ে নির্মাণ করে নিজেদের নামে চালিয়েছেন, এমন পরিচালকের সংখ্যাও কম নয়। এদের মধ্যে বাদশা ভাই, ডিপজল, এনায়েত করিমসহ অনেকেই আছেন। আর এসব নির্মাতাদের ছবি নির্মাণ করে দিয়েছেন কমল সরকার, পিএ কাজল, বেলাল আহমেদসহ অনেকে। এই কমল সরকার অনেক আগে থেকেই অশ্লীল ছবি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত।

গেল চার-পাঁচ বছরে ছবি নির্মাণের পাশাপাশি কিছু অসাধু ব্যবসায়ী শুধু কাটপিস বিক্রি করতেন। তারা ফুট হিসেবে এসব কাটপিস বিক্রি করতেন। যার আরেক নাম 'চাক্কা'। সিনেমা হল মালিকরা কাটপিসের দৈর্ঘ্য মেপে ছবির রেন্টাল বাড়াতেন, কমাতেন। জানা গেছে, এসব কাটপিস এক সময় এফডিসিতেই প্রিন্ট হতো। ল্যাব প্রধান ফয়জুল হক সরাসরি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

পরে এমডি রাজিবের হস্তক্ষেপে এফডিসিতে এসব কাটপিস কম প্রিন্ট হলেও বারী স্টুডিওতে নিয়মিত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এই দুটি ল্যাব ছাড়াও ডিএফপিতে একটি ল্যাব রয়েছে। সেখানেও কতিপয় অসাধু কর্মচারী কাটপিস ডেভেলপ করার পেছনে কাজ করছে। জানা গেছে, কাটপিসের কাজ করে ফয়জুল ঢাকার

মিরপুরে পাঁচটি বাড়ির মালিক হয়েছেন, নামে বেনামে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, কাটপিস দৃশ্যে সাধারণত অভিনয় করছেন নিম্নবিত্ত থেকে আসা কিছু মেয়ে। যাদের অনেকেই আবার আসে নারায়ণগঞ্জ কিংবা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে। এদের অনেকেই মগবাজারের বিভিন্ন হোটেলে অবস্থান করতো বলে জানা গেছে। শটের ভালগারিটির বিচারে তাদের পারিশ্রমিক ওঠানামা করতো। পুরো নগ্ন হলে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক পেতো তারা। সাধারণত বুক খোলা শট দিলে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা পেতো তারা। আর ধর্ষণ দৃশ্যে তিন হাজার টাকা।

ঢাকার ছবির এই দুর্দশার শুরু দশ বছর আগে। তবে অশ্লীলতা ভাইরাসে রূপ নেয় বছর চারেক আগে। যারা প্রযোজক থেকে পরিচালক হয়েছেন, তাদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। তাদের চিন্তা চেতনায় থাকে কি করে পুঁজি ফেরত পেয়ে বাড়তি লাভ করা যায়। ফলে শিল্পমান কিংবা ছবির গুণাগুণ কিছুই থাকতো না ছবিতে। বড় বড় বাজেটের ছবি বক্স অফিসে ব্যর্থ হলে নির্মাতারা কম বাজেটের সেক্স-ভায়োলেন্সের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আর এর মাত্রাও বাড়তে থাকে ক্রমে।

দর্শক রুচি নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলে, যারা ভালগার ছবি বানায় তারা কখনই অবুঝ মন, নয়নমণি, গোলাপী এখন ট্রেনে, সারেংবৌ-এর মতো ছবি বানাতে পারেন না। বানালে এখনও দর্শক টানবে এবং মধ্যবিত্তের বিনোদনের একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে। আর ম্যাটিনি ক্যালচার ফিরে আসবে

অথচ বাষট্টি-তেষট্টি সালে যখন এ দেশে মুম্বাই সুপার স্টার দীলিপ কুমারের ছবি, কোলকাতার উত্তম-সুচিত্রার ছবি, করাচি লাহোরের সাবিহা-সন্তোষ ও সুধীরের জয় জয়কার, তখনও এ দেশে ভালো ভালো ছবি নির্মাণ হয়েছে। এহতেশাম, মুস্তাফিজরা উঠতি তারকা শবনম, রহমান, সুভাষ দত্ত, গোলাম মুস্তাফাদের দিয়ে সে সব তারকাদের পাশাপাশি ছবি তৈরি করে পাল্লা দিয়েছেন। তৈরি করেছেন তারা অনেক সুপার হিট উর্দু ছবি। বলা চলে ষাট দশক ছিলো ঢাকাই বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ। সে সময়ে আব্দুল জব্বার খান থেকে শুরু করে জহির রায়হান, সুভাষ দত্ত, খান আতা, মহিউদ্দিন, নারায়ণ ঘোষ মিতা, এহতেশাম, মুস্তাফিজ, কামাল আহমেদরা অনেক রুচিসম্মত বাণিজ্যিক ছবি উপহার দিয়েছেন। এ পথেই এসেছেন শাবানা, কবরী, ববিতা, রাজ্জাক। তাদের জনপ্রিয়তা এখনো কিংবদন্তির মতো।

সত্তর দশকেও নির্মিত হয়েছে তরুণ নির্মাতা চাষী নজরুল ইসলামের 'ওরা ১১জন'-এর মতো ছবি। কিংবা সুভাষ দত্তের অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী, বলাকা মন, নারায়ণ ঘোষ মিতার 'আলোর মিছিল, খান আতার আবার তোরা মানুষ হ। ষাটের দশকে 'সুতরাং' সুপারহিট ব্যবসা করে এবং

'মনের মাঝে তুমি' নতুন মাইলফলক

ঢাকার একটি ছবির পোস্টারে লেখা ছিলো, 'যারা হলে যান না বা হলে ছবি দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের জন্য এ ছবি। ভালো না লাগলে দশজনকে বলুন। আর ভালো লাগলে অন্তত একজনকে বলুন'। এ কথাগুলো শুধুই যে দর্শক টানার জন্য বলা হয়েছে, তা কিন্তু নয়। বলা হচ্ছে সাম্প্রতিক মুক্তি পাওয়া মতিউর রহমান পানু'র 'মনের মাঝে তুমি' ছবি সম্পর্কে। প্রবল খরার মধ্যে এক পশলা বৃষ্টির মতো 'মনের মাঝে তুমি'। এখন প্রতিটি সিনেমা হলেই প্রতিটি শো হাউজ ফুল যাচ্ছে।

গতানুগতিক ধারার কাহিনী নিয়ে নির্মিত এ ছবিতে উপস্থাপনার ঢং আলাদা। বিশেষ করে সুন্দর চিত্রনাট্য, চটকদার সংলাপ, মনোরম লোকেশন, কমেডি সিচুয়েশন, গানের কথা ও সুর ছবিটিকে প্লাস করেছে। তার ওপর দেশের প্রথম সিনেমাস্কোপে তৈরি এ ছবিটি দর্শকরা ঝকঝকে দেখতে পাচ্ছেন। আর যেসব হলে ডিটিএস সিস্টেম আছে, তারা পরিষ্কার সুন্দর শব্দও পাচ্ছেন। ছবিটি ডলবি সাউন্ড সিস্টেমে নির্মিত। ছবিতে রিয়াজ, পূর্ণিমার প্রাণবন্ত অভিনয়, সহশিল্পীদের মন কাড়া উপস্থিতি দর্শকদের একটানা পর্দার সামনে বসিয়ে রাখবে। বিশেষ করে রিয়াজ-পূর্ণিমা আর ভারতের কুশল চক্রবর্তীর অভিনয় দর্শকরা খুব উপভোগ করবেন। এই মুহূর্তে সুস্থ ছবির দর্শকদের 'মনের মাঝে তুমি' সিনেমা হলে ফিরিয়ে আনছে। ছবিতে নেই বাড়তি সেক্স-এর সুরসুরি। নেই ভালগারিটি। এতো দিন যারা বলেছেন, ভালো ছবির দর্শক নেই, তাই তারা সিনেমা হলে যাচ্ছেন না। তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করলো এই ছবি। ভালো ছবির দর্শক সব সময়ই ছিলো, এখনও আছে। 'মনের মাঝে তুমি' সেই সব নির্মাতাদের আবার আশার পথ দেখালো। যারা অশ্লীল আর ভালগার ছবির দাপটে চুপচাপ ছিলেন, নির্মাণ থেকে দূরে ছিলেন, তারা এখন 'মনের মাঝে তুমি'কে পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজে লাগাবে।

দেশে বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়। সত্তরের পরে আশির দশকেও অনেক ভালো ভালো ছবি নির্মিত হয়েছে। তবে সেগুলো আগের তুলনায় শৈল্পিকভাবে দুর্বল। আস্তে আস্তে সবাই বাণিজ্যিক ফর্মুলার দিকে নজর দিয়েছেন। শৈল্পিক ভাবটা কমে গেছে। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের '৯০ দশকে দাঙ্গা, ফ্যাসাদ আর মারপিটের যুগ শুরু। তারপর অশ্লীলতার যুগ। এ সময়ে ভালো ভালো নির্মাতারা তাদের প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে নিয়েছেন কিংবা ছবি প্রযোজনা করছেন না। যারা দু'একটি ছবি করছিলেন সেগুলো অশ্লীল ছবির ভিড়ে ব্যবসায়িক সাফল্যে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও গত তিন বছরের সমীক্ষায় দেখা গেছে, অশ্লীল ছবির জোয়ার চললেও বছর শেষে সালতামামিতে দেখা গেছে সুস্থ সুন্দর ছবিটিই ব্যবসায়িকভাবে এক নম্বরে চলে গেছে। আম্মাজান, সুলতান, বিয়ের ফুল, স্বামী স্ত্রীর যুদ্ধ, দুই বধূ এক স্বামী কিংবা সর্বশেষ 'মনের মাঝে তুমি' বিভিন্ন সময়ে এসব সুস্থ ছবিই এক নম্বরে চলে এসেছে। অশ্লীল ছবিগুলো নগদ কিছু ব্যবসা করলেও সেগুলোর স্থায়িত্ব নেই, দ্বিতীয়বার চলে না। তারপরেও ভালো ছবি নির্মাণে সাহস পান না কেন কেউ? কারণ, একটি ভালো সুন্দর ছবির সেন্সর প্রিন্ট নির্মাণ করতে লাগে সত্তর থেকে আশি লাখ টাকা। কিন্তু অশ্লীল ছবি নির্মাণ করতে লাগে বাইশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা। সেখানে ভালো ছবিটি ফ্লপ করলে ত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা লস করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু একটি অশ্লীল ছবিতে লস খেলে বড় জোর দশ লাখ টাকা। তাই অসাধু ব্যবসায়ীরা এখানেই এসে টাকা ইনভেস্ট করছেন। কম ঝুঁকিতে তারা এটাকেই পছন্দ করছেন।

আরেকটি পক্ষ রয়েছেন যারা কালো টাকাকে সাদা করার জন্য চলচ্চিত্রে টাকা বিনিয়োগ করছেন। এরা আবার মাঝারি ধরনের ছবি নির্মাণে উৎসাহ পান। না ভালো ছবি কিংবা সরাসরি অশ্লীল ছবি না বানিয়ে তারা একটা মাঝামাঝি পথ নেয়। যেমন তারা ষাট থেকে সত্তর লাখ টাকা খরচ করে সেন্সর প্রিন্ট তৈরি করছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছবিতে তারা ২০/৩০ লাখ টাকা লস করলেও খুশি। কারণ বাকি যে ৩০/৪০ লাখ টাকা থাকছে সেগুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে।

কেউ কেউ লস ছবিটিকে সুপারহিট ঘোষণা দিয়ে নিজের কালো টাকাগুলো সাদা করে নিচ্ছেন। এর একনম্বর প্রমাণ শিল্পপতি আজিজ মোহাম্মদ ভাই। তার সরাসরি প্রযোজিত ৬/৭টি ছবি পরপর ফ্লপ করলেও তিনি নিয়মিত ছবি প্রযোজনা করছেন। নামে বেনামে এর আগে অর্ধ শতাধিক ছবি প্রযোজনা করেছেন। যার একটি (চাঁদনী) ছাড়া সব কটিই ফ্লপ কিংবা মোটামুটি। শুরু থেকে এই হিসাব করলে তিনি কয়েক কোটি টাকা লস করেছেন। কিন্তু তার আয়কর-কাগজপত্র কি তাই বলে!

অশ্লীল ছবির নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলীরা কখনোই জনপ্রিয় নয়। খ্যাতি হয় না, কুখ্যাতি হয়। টাকা পয়সাও তাদের... বড় ধরনের কিছু না। তারপরেও তারা অশ্লীল ছবি বানিয়ে চলেছেন। কেন তারা এসব ছবির পেছনে এতো সময় ব্যয় করছেন শুধুই কি টাকা? নাকি এর পেছনে অন্য কিছু কাজ করছে?

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, এসব ছবির নির্মাতারা মূলত লগ্নিকারী প্রযোজক। যখন দেখলো যে দুটো ছবি প্রযোজনা করলে পরিচালক হওয়ার সুযোগ রয়েছে তখন তারা এ সুযোগ হাত ছাড়া করেননি। একজন সহকারী পরিচালক নিয়ে গাঁজাখুড়ি একটা গল্প নিয়ে রগরগে দৃশ্যের মসলা দিয়ে ছবি নির্মাণ করে ফেলছেন। যেহেতু তাদের মেধার অভাব তাই তারা বেশির ভাগ সময় আশ্রয় নিয়েছেন সেক্স আর ভায়োলেন্সের। এসব ছবি নির্মাণের পেছনে আরেকটি বিষয় কাজ করেছে। আর তা হলো কিছু আলু-পটল ব্যবসায়ীরা মনে করেন চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করলে অনেক নায়িকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে, কোনো কোনো নির্মাতা এমন আশা দিয়েও থাকেন। যখন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন না, তখন তারা বাধ্য হয়ে বাজারের মেয়ে ডেকে এনে নায়িকা করেন। তাতে দুইটা লাভ। এক প্রযোজককে খুশি করা, অন্যটি প্রায় বিনা বাজেটে নায়িকা কাস্ট। আর বাড়তি হিসেবে এই সব মেয়েরা যে কোনো অশ্লীল দৃশ্যে অভিনয় করছেন কোনো আপত্তি ছাড়াই।

আজকের অশ্লীল ছবি নির্মাণের পেছনে আরেকটি বড় ধরনের কারণ রয়েছে। আর তা হলো সিনেমা হলের পরিবেশ। সিনেমা হলের পরিবেশ আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের কেউ ছবি দেখতে চান না। ম্যাটিনি কালচারটাই উঠে গেছে। যার ফলে নির্মিত হতে থাকে নিম্ন মানের ছবি। এই সময়ে যাও দু'একটি ভালো ছবি চলছে সেগুলো দেখার জন্য সবাই ভিড় করছেন মধুমিতা কিংবা বলাকার মতো হলে। একমাত্র এ দু'টোতেই রয়েছে ডলবি সাউন্ড সিস্টেম। বাকি সব হলে মনো সাউন্ড সিস্টেম হওয়ায় ছবি দেখতে

একটি পরিবার ও ঢাকার সিনেমা

আজ বৃহস্পতিবার। সরকারি চাকরিজীবী হারুণ সাহেব আজ তড়িঘড়ি বাসায় ফিরেছেন একটু আগেই। মতিঝিল থেকে বাড্ডায় যেতে-আসতে অনেকটা সময় চলে যায়। তিনি বাসায় এসেই স্ত্রী আর দুই কন্যাকে নিয়ে বের হলেন সিনেমা হলের উদ্দেশে। বহুদিন পর সেই পরিবারের ইচ্ছে হলো বাংলা ছবি দেখার। বেলা তিনটার আগেই তারা সিনেমা হলে পৌঁছুলেন। হলে জটলা, একটু ভিড়। ভিড় ঠেলে আর ভেতরে ঢুকতে পারলেন না। গেটের পাশে স্ত্রী সন্তানকে দাঁড় করিয়ে তিনি গেলেন টিকিট কাটতে। কিন্তু টিকিট পেলেন না। সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। অথচ তিনি গতকাল এসেছিলেন অগ্রিম টিকিট নিতে। অগ্রিম টিকিট তাকে দেয়া হয়নি। কাউন্টার থেকে বলা হয়েছিলো, সিনেমা শুরুর আগে আসলে কাউন্টারেই টিকিট পাবেন। লজ্জায় পড়ে গেলেন হারুণ সাহেব। দারুণ অস্বস্তিতে ভুগলেন। স্ত্রী আর দুই মেয়েকে যে কোথাও একটু বসিয়ে ব্ল্যাকারের কাছ থেকে টিকিট নেবেন, সে ব্যবস্থাও নেই। পাশের একটি রেস্টুরেন্টে বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ এতোটাই নোংরা যে বসার রুচি হলো না। ব্ল্যাকারের কাছে কাঙ্ক্ষিত টিকিট আর ডবল টাকা দিয়ে কেনার যুক্তি খুঁজে পেলেন না হারুন সাহেব। সুতরাং সপরিবারে ঘরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন তিক্ত অভিজ্ঞতা। ২০০৩ সালে এসে হারুণ সাহেবের এই অভিজ্ঞতা। অথচ সত্তর দশকেও সপরিবারে সিনেমা হলে গিয়ে ছবি শুরুর আগেই বিশ্রাম করাটা ছিলো ভালো লাগার বিষয়। সিনেমা হলের সুন্দর পরিবেশে বসে পপ কন কিংবা ক্যান্ডি প্লক্স খাওয়া ছিলো স্ট্যাটাস। এখন পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন সিনেমা হলে এইসব সুবিধা রয়েছে। ঢাকার মধুমিতা ও বলাকা ছাড়া অন্য কোনো সিনেমা হলে একটু আরাম করে বসার পরিবেশ নেই। অথচ একজন মধ্যবিত্ত দর্শক চান দশ টাকা বেশি দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোনো সিনেমা হলে তিন ঘন্টা কাটাতে। কিন্তু দেশের ৯৫ ভাগ সিনেমা হলে এ সুবিধা নেই।

অনেকের ফিল্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। আবার এদের একজন প্রভাবশালী মেম্বার এনায়েত করিম। বিভিন্ন সময়ে তিনি আলোচিত হয়েছেন অশ্লীল ছবির নির্মাতা হিসেবে। যদিও ফেডারেশনের ঘোষিত অশ্লীল নির্মাতাদের তালিকায় এনায়েত করিমের নাম ছিলো না

ভালো লাগে না। দর্শক শব্দ শুনতে পায় না। এসিবিহীন হল। তার ওপর ছাড়পোকার কামড়, অবাঞ্ছিত লোকজনের আনাগোনা সব মিলিয়ে সবাই হল বিমুখ হয়ে পড়েছে।

তবে সম্প্রতিক সময়ে পপি 'না' এবং রিয়াজ-পূর্ণিমার 'মনের মাঝে তুমি' ঢাকাই ছবির পালা বদলে একটা অনুঘটক ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পপির ইস্যুকে কেন্দ্র করে দুই দলের ধর্মঘট-পাল্টা ধর্মঘট পুরো ইন্ডাস্ট্রি অচল হয়ে পড়ে। পরে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের হস্তক্ষেপ চলচ্চিত্রের টালমেটাল সমস্যার সমাধান হয়। জয় হয় পপির। সুগম হয় সুস্থ ছবির আগামী পথ। অশ্লীল নির্মাতারা মন্ত্রীকে কথা দিয়েছেন সুন্দর, সুস্থ ছবি তৈরির। দর্শকদের আবার সিনেমা হলে ফিরিয়ে আনার। ঠিক সে সময়ে মতিউর রহমান পানু'র 'মনের মাঝে তুমি' নতুন পথ দেখান।

যেভাবে পপি ও 'মনের মাঝে তুমি' মধ্যবিত্তের আলোচনায় চলে এসেছে তাতে বোঝা যায় মধ্যবিত্ত চলচ্চিত্র হলে গিয়ে এখনো দেখতে চায়। সিনেমা ব্যবসায় 'মনের মাঝে তুমি' নতুন মাইল স্টোন হতে যাচ্ছে। ছবিটি এখন সবাই দেখছেন। কিছুদিন আগে ছবিটি সপরিবারে দেখলেন তারেক রহমান। ছবিটি দেখে তিনি ছবির নায়ক রিয়াজকে লিখিত শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন।

চলচ্চিত্রবোদ্ধারা বলছেন, 'মনের মাঝে তুমি'র এই সাফল্যকে ধারাবাহিক করতে হলে এখনই উচিত সিনেমা আইনের বদল করা। ১৯৬৩ সালের আইন ও নীতি দিয়ে আর যাই হোক ২০০৩ সালের সময়কে বেঁধে রাখা যাবে না। যুগ পাল্টে গেছে, প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে। সেখানে ১৯৬৩ সালের নীতিমালা দিয়ে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সম্ভব নয়। পাশাপাশি সেন্সর নীতিমালার পরিবর্তন প্রয়োজন। এখন যেখানে একটি ছবির সেন্সর সার্টিফিকেট পেতে গেলে বাড়তি ৩ লাখ টাকা লাগে, সেখানে নির্মাতাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি ছবি অশ্লীলতার দায়ে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।

কারণ তেষট্টি সালের আইন। ছোট্ট একটা জরিমানা। কিংবা ছবির সেন্সর পত্র বাতিল। এবং আবার তা আইনের ফাঁক দিয়ে বের করে নেওয়া। যেহেতু শাস্তিযোগ্য কোনো আইন নেই, তাই একই ব্যক্তি বারবার একই অপরাধ করছেন। আবার কোনো ছবি অশ্লীলতার দায়ে কিংবা কাটপিস সংযোজনের দায়ে জব্দ করা হলে পরে সেটিকে সেন্সর বোর্ডে পেশ করা হয়। কিন্তু সেন্সর বোর্ডে সেটি প্রদর্শনের আগেই কাটপিস সমৃদ্ধ প্রিন্ট সরিয়ে ফেলে। কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী যোগসাজশে সেখানে অন্য প্রিন্ট রেখে দেওয়া হয়।

ঢাকাই ছবি দেখার প্রবণতা কমে যাওয়ার আরেকটি কারণ হলো কালোবাজারে টিকিট বিক্রি হওয়া। এই সময়ে হয়তো অনেকে 'মনের মাঝে তুমি' কিংবা 'চন্দ্রকথা' দেখতে চান। কিন্তু পারছেন না কালো বাজারীদের কারণে। ত্রিশ টাকার টিকিট তারা কিনছে একশ' টাকা দিয়ে।

সিনেমা হল মালিকরা ইচ্ছে করলে টিকিটের দাম বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়াতে পারেন। যে লাভটা তারা ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে নিচ্ছেন সেটি দর্শকদের কাছে ভদ্রভাবে আদায় করতে পারেন।

এখন থেকেই নির্মাতাদের পরিহার করতে হবে আজগুবী গল্প আমদানি। ২০০৩ সালে এসেও তারা দুইশ তিনশ বছরের পুরনো অবৈজ্ঞানিক, হাস্যকর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গল্প নির্বাচন করছেন। সিনেমা হলের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আগে দরকার ছবিতে সুন্দর একটি গল্প। যা রয়েছে 'মনের মাঝে তুমি'তে। প্রয়োজন প্রতিটি সিনেমা হলে আধুনিকায়ন। সেই সঙ্গে এফডিসিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ।

জানা গেছে, এক কোটি টাকা দামের একটি অ্যারি ক্যামেরায় লুক থ্রু করলে একটি পিঁপড়ার মতো বস্তুর দৌড়াদৌড়ি লক্ষ করা যায়। সেই পোকা বা পিঁপড়ার ব্যস্ততা বেড়ে গেলে শুটিং অফ করে বসে থাকতে হয়, কখন সেই পিঁপড়া চুপচাপ হবে। অনেক ক্যামেরাম্যান

এখন ব্রোকাররাই ছবির নির্মাতা

সত্তর দশকে যেসব ছবি রিলিজ হতো, সে সব ছবিতে পাওয়া যেতো পরিচালকদের রুচির পরিচয়। আর দর্শকরাও ছিলেন রুচিসম্পন্ন। দর্শকদের সেই রুচি বেড়েছে, একটুও কমেনি। এখনকার ছবি নিম্নমানের জন্য দর্শকদের রুচির কোনো দোষ দেয়া যাবে না। কারণ আগে প্রতিটি ছবি কেমন হবে, কোথায় হবে, এর প্রযোজক-পাত্র-পাত্রী কে হবেন, সবই নিয়ন্ত্রণ করতেন একজন পরিচালক। তার সুন্দর রুচিতে একটি পরিপূর্ণ ছবির সৃষ্টি হতো। তখন 'অবুঝ মন'-এর মতো ছবি চলেছে। এ ধরনের প্রথা সত্তরের শেষ পর্যন্ত চালু ছিলো। আশির শুরুতে দেখা গেল পরিচালকদের দাপট আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। কারণ আগে চলচ্চিত্র ছিলো শিল্পকর্ম। পরে ব্যবসা। কিন্তু আশিতে প্রযোজকরা সেটাকে প্রথমে ব্যবসা পরে শিল্পকর্ম হিসেবে দেখতে শুরু করে। যার ফলে ছবি নির্মাণে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয়ে গেলো। পরিচালক সব সময়ই প্রযোজকের মতামত নিয়েই সব কিছু করতেন। নব্বইয়ের পরে তা পুরোপুরি প্রযোজক নির্ভর হয়ে গেল। অর্থাৎ একজন প্রযোজকের রুচির ওপর ছবি নির্মাণ করতে থাকেন পরিচালকেরা। সেখানে পরিচালকরা শুধুই শ্রমিক। কিছু সংখ্যক পরিচালক ছাড়া সবাই যেন প্রযোজকের বাজে রুচিতে প্রাধান্য দিতে থাকে। আর তখনই ঢালাওভাবে নকল ছবি নির্মাণের হিড়িক পড়ে। আর এখন যে কোনো ছবি নির্মাণে একজন ব্রোকারের রুচির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ব্রোকাররাই বলে দেন ছবির শিল্পী কারা হবেন কিংবা এর নির্মাণশৈলী কেমন হবে। ভিলেন কিংবা কমেডিয়ানের কয়টা গান থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ একজন ব্রোকারই নির্ধারণ করে দেন কোন ছবিটা কোন হলে কতদিন চলবে। অর্থাৎ একজন প্রযোজক পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা দিয়ে ছবি নির্মাণ করলেও কয়েকজন ব্রোকারের কারণে তা ভেস্তে যেতে পারে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পরিচালক কাজী জহিরের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'চিত্রা ফিল্মস'। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'মিনিস্টার'। পরিচালনা করেছেন কাজী হায়াৎ। আর প্রযোজনা সংক্রান্ত সামগ্রিক দিক দেখাশোনা করেছেন কাজী জহিরের ছেলে কাজী সাগর। আমেরিকায় এমবিএ করা সাগর তার স্টাইলে ছবির রেন্টাল করলেন। এবং তিনি ঘোষণা দিলেন ছবি মিনিমাম গ্যারান্টি ছাড়া দেবেন না। কিন্তু ব্রোকাররা সেটিকে পারসেন্টেস হিসেবে চালাতে চান। তাতে ব্রোকারদের চুরি করার একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু এমজি (মিনিমাম গ্যারান্টি)তে দিলে সে সুযোগ থাকে না। সাগরের এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে ব্রোকাররা এক হয়ে বিভিন্ন সিনেমা হলে ছবি দেয়া বন্ধ করে দিলেন। তাতে সাগরের সাময়িক ক্ষতি হয়। কিন্তু পরে হল মালিকরা সরাসরি সাগরের কাছ থেকে ছবি নিয়ে চালিয়েছেন। তাতে হল মালিক এবং প্রযোজক সাগর দু'জনেই লাভবান হয়েছেন।

যেভাবে পপি ও 'মনের মাঝে তুমি' মধ্যবিত্তের আলোচনায় চলে এসেছে তাতে বোঝা যায় মধ্যবিত্ত চলচ্চিত্র হলে গিয়ে এখনো দেখতে চায়। সিনেমা ব্যবসায় 'মনের মাঝে তুমি' নতুন মাইল স্টোন হতে যাচ্ছে। ছবিটি এখন সবাই দেখছেন

সেই পিপঁড়াটিকে বের করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ সফল হতে পারেননি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেটি কি পিঁপড়া নাকি যান্ত্রিক কোনো গোলযোগ। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের দরকার দক্ষ প্রশিক্ষক এবং সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞ।

একটু দেরিতে হলেও পপিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন বেগবান হয়েছে। সবাই ঐকমত্য হয়েছেন ভালো ছবি তৈরির জন্য। কিন্তু গেল এপ্রিলে শুরু করা প্রযোজক সমিতির আন্দোলনে ভিডিও পাইরেসি, আধুনিক যন্ত্রপাতি, হলের পরিবেশসহ কয়েক দফা দাবি নিয়ে রাজপথে নামে। কিন্তু সেখানে অশ্লীল ছবির নির্মাতা-শিল্পীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাতে পরিষ্কার ছিল না অশ্লীলতার বিষয়টি। কিন্তু এবার ফেডারেশনের প্রথম ছবি ছিল অশ্লীলতা এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বহিষ্কার করলে আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়েছে।

ঢাকাই ছবির পালা বদলের অনুঘটক নায়িকা পপি। আসছে সামনে সুস্থ ছবির দিন। ফিরে আসবে চলচ্চিত্রের পূর্ব ঐতিহ্য।

বাংলা ছবি কম দেখার সবচেয়ে দুর্বল কারণ হলো সিনেমা হলের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা। স্থানীয় প্রশাসন এব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা রাখছেন না। ফলে সিনেমা হলে দর্শক আস্তে আস্তে কমতে থাকে। আর তাই গেল পাঁচ বছরে দেড়শ' সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে। সেসব জায়গায় নির্মিত হয়েছে বহুতল ভবন কিংবা মার্কেট। বর্তমানে সারাদেশে আটশ' সিনেমা হল রয়েছে। এর পাঁচশটিতে হলে কোনো রকমে ছবি চলছে। অবাক করা বিষয় এই পাঁচশ সিনেমা হলের জন্য মাত্র ছয়জন ইন্সপেক্টর রয়েছেন। যাদের কাজ হলো সেন্সরের বাইরে ছবিতে কোনো দৃশ্য সংযোজন করা হয়েছে কিনা তা দেখা। এতোগুলো সিনেমা হল নিয়মিতভাবে চেক করা মাত্র ৬ জন ইন্সপেক্টরের পক্ষে কি সম্ভব? যদিও ছয়জন ইন্সপেক্টর সাঈদ হাসান, বিবেকা নন্দ রায়, সাঈদা বেগম, নুশরাত জাহান, ইমদাদুল হক ও ফজলে রাব্বী দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে বড়লোক হচ্ছেন। আবার হয়তো এই ৬ জনের কেউ একটা ছবির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবেদন দিতে যাবেন এর জন্য ভাইস চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিতে হয়, এখানেও রয়েছে আইনের ফাঁক।

হল মালিকদের একটি চক্র আছে। যারা এক সপ্তাহের জন্য ছবি চুক্তি করলেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ অন্য সিনেমা হলে ভাড়া দিয়ে দেয়। এ ব্যাপারেও প্রযোজকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অন্যপথ ধরছেন। শিল্পীদের সময় জ্ঞান এবং পারিশ্রমিক কমানোর পাশাপাশি বড় প্রয়োজন এফডিসিতে শিফট ওয়াইজ ভাড়া কমানো। এরই মধ্যে এমডি রাজিব এফডিসিতে সেট নির্মাণ সময়ে ফ্লোর কিংবা স্পট ভাড়া মওকুফ করে দেন। কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয় বলে ফেডারেশন জানায়।

২০০১ সালে অশ্লীলতা আন্দোলন হয়েছিল। সেটা চূড়ান্ত ফলাফল পায়নি। কিন্তু এবার ফেডারেশন পপিকে কেন্দ্র করে অনেক দূর এগিয়েছে। এখন শুধু দরকার, সরকারের সদিচ্ছা।

চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে এই মহাদেশে বিশেষ করে ভারতে একটি বিশাল কালচার গড়ে উঠেছে। শুধু কালচার কেন, এই চলচ্চিত্রকে নিয়ে ভারত সারা বিশ্ব জয় করে ফেলেছে। চলচ্চিত্র বিনোদন ভারতে এখন বড় ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী মাধ্যম। এর বিশাল অংশ আসছে বসবাসকারী ভারতীয় পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশীদের কাছ থেকে। দেশ-বিদেশে মিলিয়ে সংখ্যার দিক থেকে বাংলা ভাষাভাষি দর্শকদের সংখ্যা বোধ হয় হিন্দির পরে। কিন্তু আমরা সেদিকটার একটা অংশও পাচ্ছি না।

আমাদের এখানে বিনোদনের কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা নেই। স্টেডিয়ামগুলো শূন্য পড়ে থাকে। খোলা জায়গা একেবারেই কম। রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। আর ট্রাফিক জ্যাম।ভারতের বড় সিনেমা হলগুলোতে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত সজাগ আনন্দময় পরিবেশ দেখা যায়। হলগুলো দিনে দিনে ক্রমেই সুন্দর হয়ে উঠছে। কোনো কোনো হল ট্যুরিস্ট আকর্ষণ হিসেবে দেখানো হয়। দিল্লিতে গড়ে উঠছে সিনেমা কমপ্লেক্স। সেখানে গাড়ি পার্কিং, শপিং এবং রেস্তোরাঁ সবই আছে। অর্থাৎ একটি পরিবার দুপুরে ঢুকে রাতে ডিনার করে ফেরে। আর বাংলাদেশে ম্যাটিনি কালচার বলে কিছুই নেই, যা সত্তরের দশকে ছিলো। এখন একটি ছেলে একটি মেয়েকে বলে না, অমুক হলে এসো দেখা হবে বা আমরা দুটো টিকিট কিনেছি। এখন অশ্লীল, অশালীন, ভালগার দিয়ে হল চলছে। বিদেশী ছবি আমদানি হয় যেগুলো হংকংমার্কা আজেবাজে ছবি। সেজন্য এখানে যখন টাইটানিক, ব্রেভহার্ট আসে তখন মধ্যবিত্তের ঢল নামে সিনেমাগৃহে। এমনকি পদ্মা নদীর মাঝি, মাটির ময়না, চন্দ্রকথা রিলিজ হলেও মধ্যবিত্তের বিত্তে নাড়া খায়। আর 'মনের মাঝে তুমি' তো দেশব্যাপী বাম্পার হিট করে গেলো। দর্শক রুচি নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলে, যারা ভালগার ছবি বানায় তারা কখনই অবুঝ মন, নয়নমণি, গোলাপী এখন ট্রেনে, সারেংবৌ-এর মতো ছবি বানাতে পারেন না। বানালে এখনও দর্শক টানবে এবং মধ্যবিত্তের বিনোদনের একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে। আর ম্যাটিনি ক্যালচার ফিরে আসবে। দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যদি গ্ল্যামার সংযুক্ত করা যায় তবে বিদেশে এ ধরনের ছবি রিলিজ দেয়া যেতে পারে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে হবে ভালগারিটি ছেড়ে, নান্দনিক দিকে। সেটা যৌন আবেদনের ক্ষেত্রেও। ঢাকার ছবিকে ফিরতেই হবে শিল্পের মূলধারায়। এছাড়া চলচ্চিত্রকে ঠেকানো যাবে না।